প্রতিবাদী ধর্ম-আন্দোলন এক ব্যাপক সামাজিক বিপ্লবের নামান্তর ছিল এবং বৈষয়িক ও মানসিক পটভূমির থেকে উদ্ভূত এক আন্দোলন ভারতের জাতীয় জীবনের বিবর্তনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

বুদ্ধদেবের প্রথম জীবন ঃ বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ উত্তরপ্রদেশে, হিমালয়ের কোলে কপিলাবস্তুর রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন (আনুমানিক ৫৬৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে)। লুম্বিনী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। এই তথ্য অশোকের শিলালিপি (২৫০ খ্রীঃ পূর্ব) কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, "এই স্থানে বুদ্ধ শাক্যমনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন"। তাঁর পিতা শুদ্ধোধন শাক্যজাতির নায়ক ছিলেন এবং তাঁর মাতার নাম ছিল মায়াদেবী। 'সুত্তণিপাত' অনুযায়ী শাক্যরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়কুল থেকে উদ্ভূত। সিদ্ধার্থের জন্মের অব্যবহিত পরেই মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হলে তিনি বিমাতা ও মাতৃস্বসা প্রজাপতি গৌতমীর দ্বারা লালিতপালিত হন। বুদ্ধের পূর্বনাম সিদ্ধার্থ। শাক্যবংশীয়দের গোত্রনাম ছিল গৌতম বা গোতম। এই জন্য বুদ্ধকে 'গৌতম' বলা হয়। ষোল বছর বয়সে গোপা বা যশোধরা নাম্নী এক রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু সংসারের ভোগবিলাসের প্রতি তিনি শৈশব থেকেই উদাসীন ছিলেন। জীবনের দুঃখকষ্ট, জরা, মৃত্যু তাঁর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করে। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে চারটি পরপর দৃশ্য গৌতমের অন্তরে গভীর বেদনার উদ্রেক করে—এই দৃশ্যগুলি হল প্রথমটি জরা, দ্বিতীয়টি ব্যাধি, তৃতীয়টি মৃত্যু এবং চতুর্থটি এক গেরুয়া ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মূর্তি। এই সকল দৃশ্য দেখে গৌতম উন্নত জীবনের সন্ধানের জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। পুত্রের (রাহুল) জন্মের পর সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে অবশেষে একদিন স্ত্রী, নবজাত পুত্র রাহুল ও রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস পরিত্যাগ করে গৌতম সত্য ও জ্ঞানের সন্ধানে বের হলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৯। এই ঘটনা 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' নামে সুপ্রসিদ্ধ।

বংশ পরিচয়

বুদ্ধত্বলাভ ঃ গৃহত্যাগ করার পর কিছুদিন তিনি বৈশালী ও রাজগৃহে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হন, কিন্তু জগতের রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলেন না। পরিশেষে গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক স্থানে ধ্যানে নিমগ্ন হন এবং এই স্থানেই একদিন তিনি 'বোধি' বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি 'বুদ্ধ' (পরম জ্ঞানী) বা 'তথাগত' (যিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন) নামে পরিচিত হন।

ধর্মপ্রচার ও নির্বাণলাভ ঃ 'পরমজ্ঞান' লাভ করে বারাণসীর উপকূলে সারনাথে এসে তিনি তাঁর নতুন ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। এর পর প্রায় ৪৫ বছরকাল মগধ, কোশল প্রভৃতি পূর্ব-ভারতের নানা স্থানে ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। সারনাথে পঞ্চভিক্ষু নামে পরিচিত তাঁর অনুচরদের কাছে তিনি সর্বপ্রথম উপদেশ বিতরণ করেন। ইহা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে কীর্তিত। মগধ-রাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু, কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সহায়তা করেন। জীবদ্দশায় বুদ্ধ বহু শিষ্য লাভ করেন। রাজগৃহে শারিপুত্র ও মৌদ্গল্লায়ন তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন। কপিলাবস্তুতে বুদ্ধ পিতা, পুত্র, স্ত্রী এমনকি দেবদত্তকেও এই ধর্মে দীক্ষিত করেন। প্রতি বছরের আট মাস বুদ্ধ স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উরুবিল্ব, নালন্দা ও পাটলিপুত্র। বর্ষার চার মাস তিনি ধনী-গৃহী শিষ্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতেন।

ধর্মচক্র প্রবর্তন

বুদ্ধের মত অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রচারকরাও বর্ষাকালে এক নির্দিষ্ট স্থানে থাকতেন। বুদ্ধের প্রিয় আশ্রম ছিল বিখ্যাত জেতবন বিহার, এস্থানটি অনাথপিণ্ড তাঁকে দান করেন। এই জেতবন বিহার থেকেই তিনি তাঁর অধিকাংশ উপদেশ বিতরণ করেন। প্রচারকরূপে তাঁর জীবন মোটামুটি শান্তিপূর্ণই ছিল। যদিও মল্লরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তথাপি এদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। তাঁর শিষ্যরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—উপাসক এবং ভিক্ষু। যাঁরা শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংসার ধর্ম পালন করতেন, তাঁরা 'উপাসক' নামে ; আর যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন, তাঁরা 'ভিক্ষু' নামে পরিচিত হন।

দুই শ্রেণীর শিষ্য

বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়াও 'বৌদ্ধসঙ্ঘ' (Council) নামে এক ধর্মপ্রতিষ্ঠানও গঠন করেন। এই 'সঙ্ঘ' বৌদ্ধধর্মের এক প্রধান অঙ্গ ছিল। 'বুদ্ধ', 'ধর্ম' ও 'সঙ্ঘ'—এই তিনটি ছিল বৌদ্ধধর্মের ত্রিস্তম্ভ স্বরূপ।

বৌদ্ধ সংঘ

৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে বুদ্ধের নির্বাণলাভ হয়। এই ঘটনা 'পরিনির্বাণ' নামে অভিহিত। বুদ্ধের 'পরিনির্বাণ' কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে। অনেকের মতে ৪৮৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে, আবার কারোর মতে ৫৪৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে 'পরিনির্বাণ' ঘটে। চৈনিক সাক্ষ্য-প্রমাণে ৪৮৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বুদ্ধের 'পরিনির্বাণ' কাল উল্লিখিত আছে। সিংহলদেশীয় কিংবদন্তী চৈনিক মত সমর্থন করে। এই কিংবদন্তী অনুসারে অশোকের রাজ্যাভিষেকের ২১৮ বছর পূর্বে বুদ্ধ নির্বাণলাভ করেন (অর্থাৎ ২৬৮+২১৮=৪৮৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)।

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ কাল সম্বন্ধে মতভেদ

বৌদ্ধ ধর্মমত ঃ বুদ্ধ ছিলেন বাস্তবধর্মী সংস্কারক। সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে মানুষ যাতে মুক্তি পায়, তাই ছিল বুদ্ধদেবের একমাত্র কামনা। বুদ্ধ চারটি মহান সত্যের বিশ্লেষণ করেছেন। এগুলি 'আর্যসত্য' নামে অভিহিত। সত্যগুলি হল—(১) সংসারে দুঃখকষ্ট রয়েছে, (২) এই দুঃখকষ্টের কারণ ও আছে, (৩) দুঃখ-কষ্টের অবসান প্রয়োজন এবং (৪) এর অবসান করার সত্যপথ জানতে হবে।

'আর্যসত্য'

তাঁর মতে জন্মই দুঃখের কারণ; পার্থিব ভোগতৃষ্ণা থেকেই দুঃখের জন্ম এবং তৃষ্ণাই মুক্তির পরিবর্তে বারংবার জন্মান্তর ঘটায়। সুতরাং তৃষ্ণার অবসানকল্পে বুদ্ধ 'অষ্টপন্থা' বা 'অষ্টাঙ্গিক মার্গে'র নির্দেশ দিয়েছেন। এই 'অষ্টপথ' বলতে বুঝায় (১) সৎ সংকল্প, (২) সৎ চিন্তা, (৩) সৎ বাক্য, (৪) সৎ ব্যবহার, (৫) সৎ জীবনযাপন, (৬) সৎ প্রচেষ্টা, (৭) সৎ দৃষ্টি ও (৮) সম্যক্ সমাধি।

অষ্টপন্থা বা অষ্টাঙ্গিক মার্গ

বৌদ্ধধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গের সামাজিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কৌশাম্বির মতে সৎ বাক্য বলতে বুদ্ধ পারস্পরিক বন্ধুত্বের পরিপোষক, পরিমিত ও সত্য বাক্য বুঝিয়েছেন। বুদ্ধের মতে এর অন্যথা হল মিথ্যাকথা যা সমাজ সংগঠনের ক্ষতি করে। বুদ্ধের মতে চুরি, হত্যা, ব্যভিচার সমাজজীবনের ক্ষতি করে। এই কারণে তিনি সৎ কর্মের উপদেশ দিয়েছেন। সৎ জীবিকা বলতে বুদ্ধ পবিত্রভাবে ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জীবিকা অর্জনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে পরিবারের ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক জীবিকা সদা-সর্বদা পরিহার করে চলা মানুষ মাত্রেরই মহান কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে তিনি মদ, মাংসের ব্যবসাকে সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। সৎ প্রচেষ্টা বলতে বুদ্ধ এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, মানুষের মনে কুচিন্তা যেন প্রবেশ না করে এবং মনের সহজাত সু-চিন্তা সদা-সর্বদা জাগ্রত রাখে। সৎ সংকল্প বলতে বুদ্ধ এই কথাই বুঝিয়েছেন যে, অন্যের ক্ষতিসাধন করে নিজের সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধি না করা এবং সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও ভালবাসা অটুট রাখা। বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের দুঃখের প্রধান কারণ হল অনিয়ন্ত্রিত বাসনা ও প্রলোভন। তাঁর মতে এই বাসনার নিবৃত্তির অবসান করাই মানুষের শান্তি অর্জনের একমাত্র পথ। এই দৃষ্টিকেই তিনি সৎ দৃষ্টি বলেছেন।

ভোগ ও কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে এই আটটি পথই বুদ্ধের প্রদর্শিত মহৎ 'মধ্যপন্থা'। এই 'মধ্যপন্থাই' নির্বাণলাভের চরম পথ এবং শুধু তৃষ্ণারই অবসান হয় এমন নয়, মানুষের মনেও যথার্থ শান্তি আনে। বুদ্ধ একদিকে চরম অসংযম ও অন্যদিকে চরম কৃচ্ছ্রসাধন—দুই-ই বর্জন করে মধ্যবর্তী পথ অনুসরণের কথা বলেছেন।

মধ্যপন্থা

অষ্টাঙ্গিক মার্গের নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নৈতিক উপদেশও আছে। তাঁর নৈতিক উপদেশগুলি ধর্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে বিবেচিত হয়েছে। যেমন—'শীল' (হিংসা, পরস্বাপরহণ, ব্যভিচার, মদ্যপান, মিথ্যা-ভাষণ থেকে বিরতি), সমাধি (বা মনঃসংযোগ), প্রজ্ঞা (বা অন্তর্দৃষ্টি) ইত্যাদি।

নৈতিক উপদেশ
'পঞ্চশীল

বুদ্ধদেব ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক, ঈশ্বর ও আত্মার স্বরূপ ও দেব-দেবী সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তিনি নীরব।

সমালোচনা ঃ মূলত বৌদ্ধধর্ম কোন এক নতুন ধর্ম ছিল না। তা এক পবিত্র জীবনধারণের প্রতি নির্দেশ মাত্র। পানিকর বৌদ্ধধর্মকে নতুন এক ধর্ম না বলে এক অতি-প্রাকৃতিক সত্যের প্রকাশ (revelation) বলে মন্তব্য করেছেন।* স্মিথ বলেন, "Buddha can hardly be said to have had or to have taught a religion properly so called"। যদুনাথ সরকার মৌলিক বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের এক নব রূপায়ণ বলে বর্ণনা করেছেন। বুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেরিত দূত ছিলেন না, তিনি তাঁর শ্রোতা ও শিষ্যবর্গকে কতকগুলি নৈতিক উপদেশ দান করেছিলেন মাত্র। যেমন—যথার্থ বিশ্বাস, পবিত্র জীবনযাপন ও সৎকার্য ইত্যাদি সকল ধর্মেরই মূল মন্ত্র। তিনি কোন নতুন ধর্মমত বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা নতুন দর্শন প্রচার করেন নি। সংসারের দুঃখকষ্ট ও পার্থিব ভোগতৃষ্ণার অবসানকল্পে তিনি যে 'অষ্টপন্থার' নির্দেশ দিয়েছেন, তা মূলত নৈতিকবাচক। বুদ্ধের সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তকরাও এই ধরনের নৈতিক আচরণের কথা প্রচার করেছিলেন। 'জাতক' নামক গ্রন্থে বুদ্ধ নিজেই বলেছেন যে, সত্য ধর্ম বলতে কতকগুলি প্রার্থনা, স্তোত্র বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড বোঝায় না—তা পবিত্র জীবনযাপন ও জীবের মুক্তি বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় অন্যান্য জ্ঞানদীপ্ত ধর্মপ্রচারকরাও প্রায় একই ধরনের আদর্শের কথা প্রচার করেছিলেন। একমাত্র পার্থক্য হল এই যে, বুদ্ধের বাণী অগণিত শ্রোতার কাছে পৌঁছেছিল। বুদ্ধের ব্যক্তিগত উন্নত চরিত্র, মানবতাবোধ, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি মমত্ববোধ এবং সহজ ও সরল ভাষায় শিক্ষাদান বৌদ্ধধর্মকে অনেক বেশী জনপ্রিয় করে তোলে। সাধারণ মানুষের কাছে বুদ্ধের বাণী এক নতুন ধর্মমত বলে প্রতিভাত হল। উপনিষদে উল্লিখিত গোপন মন্ত্র, ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞ ও বলিদানের বিধান বৌদ্ধধর্মে ছিল না। বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মকে ধর্মীয় বিবর্তন না বলে সামাজিক বিবর্তন বলাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। তাঁর প্রবর্তিত সঙ্ঘ বা আশ্রম কোন নতুন উদ্ভাবন ছিল না। তাঁর পূর্বেও মুনি-ঋষিদের আশ্রমের উল্লেখ আছে। তবে বুদ্ধ সংঘ বা আশ্রমকে বেশীমাত্রায় গণতন্ত্র-সম্মত করে তুলেছিল, যার দৃষ্টান্ত বুদ্ধ-পূর্ব যুগে পাওয়া যায় না। বুদ্ধের শিক্ষা ছিল আংশিক সংস্কারমূলক ও আংশিক উদ্ভাবনমূলক। তিনি বৈদিক ধর্মের ও সমাজের আচার-আচরণগুলির সংস্কারসাধনে সচেষ্ট হন এবং সেই সঙ্গে আত্মার মুক্তির জন্য কয়েকটি নতুন পথের নির্দেশও দেন। বুদ্ধ নিজেকে কোন নতুন ধর্মের প্রবর্তক বলে সম্ভবত মনে করেন নি। তিনি নিজেকে সংস্কারক বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাঁর জোরদার প্রচার এক বৈপ্লবিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল যদিও তিনি নিজেকে কখনও প্রচলিত সমাজের

সংস্কারক বা উদ্ভাবক?

---

* *কে. এম. পানিকর—"It was not a new religion, but a new revelation which the great teacher was preaching"—A Survey of Indian History—পৃঃ ২০।*

উৎপাটক বলে কখনও দাবি করেন নি। তিনি সমকালীন সমাজের মূল কাঠামোটি বজায় রেখে তার ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর কঠোর আক্রমণ হানেন। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, বুদ্ধ সমাজ-বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তাঁর বাণী ছিল মূলত ক্ষত্রিয় আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস বর্জন করলেও, বুদ্ধ প্রাচীন ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হতে পারেন নি। রিজ ডেভিডস্ (Rhys Davids)-এর ভাষায়, "Gautam was born and brought up and lived and died as a Hindu. The difference between him and other teachers lay chiefly in his deap earnestness and in his broad public spirit and Philanthropy." অবশ্য একথাও ঠিক, সমকালীন যুগের চিরাচরিত ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণের বিরুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম বিপ্লবের বীজ বপন করেন।

বুদ্ধের প্রবর্তিত বৌদ্ধ সঙ্ঘই তাঁর কৃতিত্ব। কিন্তু সঙ্ঘের নিয়ম ও আচার-পদ্ধতিগুলির ব্যাখ্যা তিনি সুবিন্যস্ত করে যেতে পারেন নি। স্মিথের কথায়, "He also taught as other, had taught before him, a simple easily understood 'dharma' or rule of life".

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ঃ বুদ্ধের নির্বাণলাভের কিছুকাল পরে তাঁর শিষ্যরা রাজগৃহে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে বুদ্ধের উপদেশাবলী সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম 'ত্রিপিটক'। এটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত ঃ

ত্রিপিটক

(১) বিনয়-পিটক (বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের পালনীয় বিধিসমূহ ও সঙ্ঘের নিয়মাবলী), (২) সূত্র-পিটক (বুদ্ধের উপদেশাবলী), (৩) অভিধর্ম-পিটক (বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ)। সূত্র-পিটক আবার 'নিকায়' নামে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। 'জাতক' গ্রন্থও বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থাদির অন্তর্ভুক্ত। যদিও 'জাতক' উপাখ্যানগুলি মৌর্যযুগের পরবর্তী কালে রচিত, তথাপি জাতক থেকে বুদ্ধের প্রথম জীবন ও তৎকালীন যুগের সমাজ ও ধর্ম জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধসঙ্ঘ ঃ বুদ্ধ তাঁর ধর্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগঠনও স্থাপন করেন। এই সঙ্ঘ ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের প্রতিষ্ঠান। পঞ্চদশ বছরের সকল ব্যক্তির কাছে এর সদস্যপদ উন্মুক্ত ছিল। পুরুষ ছাড়া নারীরাও সদস্য হতে পারত ; তবে নিয়ম ছিল যে,

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান

(১) পুরুষ ভিক্ষুকদের সঙ্গে ভিক্ষুনারী একত্রে বাস করতে পারবে না। (২) প্রতি মাসে দুবার ভিক্ষুনীদের সঙ্ঘ পরিচালকের কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে হত এবং (৩) ধর্মবিরোধী কার্যের জন্য ভিক্ষুক ও ভিক্ষুনীদের এক যৌথ সভায় শাস্তি দেওয়া হত। সঙ্ঘের প্রতি অবিচলিত আস্থা সদস্যদের প্রধানতম কর্তব্য ছিল। আজও প্রত্যেক বৌদ্ধকে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' এই শপথ নিতে হয়। সমাজের সকল স্তর থেকে সদস্য গ্রহণ করায় সঙ্ঘের স্বরূপ ছিল গণতান্ত্রিক। বুদ্ধ গণিকা, নিম্নবর্ণ, রাজা, ব্রাহ্মণ, সকলেরই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন।

সঙ্ঘের গুরুত্ব

অন্তত দশজন ভিক্ষুক সম্মিলিত না হলে সঙ্ঘের সভা বসত না, কোনরূপ সিদ্ধান্তও নেওয়া হতো না। ভোটগ্রহণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও অন্যান্য যাবতীয় কার্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধসঙ্ঘ বলতে বহু স্থানীয় সঙ্ঘ বোঝাত। প্রকৃতপক্ষে বজ্জি, লিচ্ছবি, শাক্য প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তির ওপর বৌদ্ধসঙ্ঘের রীতি ও নীতি প্রবর্তন করেন। সঙ্ঘের কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। বৌদ্ধসঙ্ঘের গুরুত্ব সম্পর্কে পানিকর বলেন, "The great monastic orders which spread all over the world under the shadow of different religions arose out of them"*

* কে. এম. পানিকর—*A Survey of Indian History*—পৃঃ ২০।

বৌদ্ধধর্মের ওপর বৈদিক ধর্মের প্রভাব ঃ প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্ম বলতে শুধুমাত্র নৈতিক আচার-অনুষ্ঠানই বোঝাত। কিন্তু কালক্রমে অস্তিত্ব রাখার জন্য এক বিশিষ্ট দার্শনিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। সে সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য দর্শনশাস্ত্রই প্রচলিত ছিল। ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু বৌদ্ধ ধর্মমতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমদিকে বৈদিক দর্শনের ভিত্তির ওপর বৌদ্ধ দর্শন বা বৌদ্ধ ধর্মমত গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি ছিল কর্মবাদ। উপনিষদেও কর্মবাদের উল্লেখ আছে। বুদ্ধ স্বীকার করেছিলেন যে, মানুষের ইহকালের কর্ম অনুসারে পরবর্তী জন্ম নির্ধারিত হয়। এই কারণেই বুদ্ধ বলেছেন যে, জীবাত্মার মুক্তির একমাত্র উপায় হল সৎ ও আদর্শপূত কর্ম। বস্তুত উপনিষদে যা বলা হয়েছিল, বুদ্ধ তাই অনেকাংশে গ্রহণ করেন। তৃতীয়ত, সাংখ্য দর্শনশাস্ত্র ও পূর্বতন যুগের যোগশাস্ত্র বুদ্ধ তথা বৌদ্ধধর্মকে প্রভাবিত করেছিল।

বৌদ্ধধর্মের সাফল্যের কারণ ঃ বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁর প্রচারিত ধর্ম ভারতে ও ভারতের বাইরে মধ্য-এশিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে বিস্তারলাভ করে। সম্রাট অশোকের প্রচেষ্টায় এই ধর্ম এক বিশ্বব্যাপী মহাধর্মে রূপান্তরিত হয়। ভারতের আর কোন ধর্মই বিশ্বধর্ম রূপে স্বীকৃতি লাভ করে নি। এই অভাবনীয় সাফল্যের ও বিস্তারের কয়েকটি কারণ দেখা যায়।

বুদ্ধের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

(১) বুদ্ধের মহানুভবতা, চারিত্রিক শক্তি, সহজ, সুন্দর ও মর্মস্পর্শী উপদেশ এই ধর্মের সাফল্যের প্রধান কারণ। উইল ডুরান্ট-এর মতে বুদ্ধ ছিলেন গভীর আত্মবিশ্বাসী, বিনম্র ও মৃদুভাষী। উইল ডুরান্ট-এর কথায় "In controversy he (Buddha) was more patient and considerate than any other of the great theacher of mankind".

বেদান্ত ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

(২) বৈদিক ধর্মের জটিল ক্রিয়াকলাপ, নিষ্ঠাহীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও উপনিষদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে পড়ায় জনসাধারণের পক্ষে ধর্মের মর্মকথা বোঝার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতা ও পশুবলির প্রথা জনসাধারণের মনে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই বৌদ্ধধর্ম প্রসারে প্রভূত সহায়তা করে।

সমাজব্যবস্থা

(৩) সে সময়ের সমাজের কঠোর জাতিভেদ-প্রথা, নিম্নশ্রেণীর ওপর ব্রাহ্মণদের নির্যাতন, ব্রাহ্মণশ্রেণীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষমতাশীল ক্ষত্রিয়দের ক্ষোভ বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করে।

বৌদ্ধসঙ্ঘের গণতান্ত্রিক সংগঠন ও বুদ্ধের সহজ উপদেশ

(৪) ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদের বিরোধিতা, দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা না করে সহজবোধ্য ভাষায় ধর্মমত প্রচারে ও বৌদ্ধসংঘের গণতান্ত্রিক গঠন ও ভিক্ষুক ও ভিক্ষুনীদের আদর্শপূত জীবন বৌদ্ধধর্মকে সহজেই জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা

(৫) বিম্বিসার, অশোক, কণিষ্ক , হর্ষবর্ধন প্রমুখ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেশে ও বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের পথে সহায়ক হয়। সমসাময়িক যুগে রাজার ধর্মই ছিল প্রজার ধর্ম। এই সকল নৃপতিবর্গ শুধু দীক্ষা গ্রহণ করে নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। অপরিমিত অর্থব্যয় এবং নানাবিধ পদক্ষেপ এই ধর্মমত প্রসারে সহায়তা করে।

(৬) সেই সময় ভারতে বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম না থাকায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার সহজ হয়েছিল। খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্মের জন্ম তখনও না হওয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রসারের পথে কোন প্রতিপক্ষ ছিল না।

(৭) বৌদ্ধধর্মের সাফল্যের অপর কারণ ছিল সুশৃঙ্খল সঙ্ঘ। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের আদর্শপুত জীবনধারা এবং ধর্মপ্রচারে তাদের নিষ্ঠা এই ধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে।

(৮) সেই যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে বৈদিক ধর্ম ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে বহির্বিশ্বে প্রসার লাভ করতে পারে নি এবং বৈদিক আর্যরা বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে মোটেই সচেতন ছিলেন না। পারসিক ও আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের যোগাযোগ উন্মুক্ত হয় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসার সহজ হয়।

বৌদ্ধধর্মের অবনতির কারণ ঃ বৌদ্ধধর্মের প্রসার যেমন একটি বিশেষ যুগে ঘটে নি, সেরকম পতনও এর ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ধরে ঘটেছিল। এর অবনতিরও একাধিক কারণ লক্ষ্য করা যায়।

(১) রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

মৌর্যযুগের অবসানের পর থেকে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। কণিষ্ক ও হর্ষবর্ধন ছাড়া কোন নৃপতিই বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাননি। গুপ্ত রাজাদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং শঙ্করাচার্য, কুমারিলভট্ট প্রমুখ হিন্দু সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

(২) হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের অভিন্নতা

সপ্তম ও অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে সমাজসংস্কারের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবিত হলে মহাযান বৌদ্ধধর্মের তপস্যাবাদ ও ভক্তিবাদ যথাক্রমে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় আয়ত্ত করে, এর ফলে হিন্দুপুরাণে বর্ণিত যোগরত শিবের সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধধর্মের ধ্যানমগ্ন-বুদ্ধের আর পার্থক্য থাকল না। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথযাত্রা, মন্দির, পূজার জাঁকজমক, ভক্তিবাদ অথবা ঈশ্বরকে মনুষ্যজ্ঞানে অর্চনা করা এই সমস্তই বৌদ্ধধর্ম থেকে পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্মে গৃহীত হয়। বঙ্গদেশের পাল রাজাদের রাজসভায় হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্ত্রিরা সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় বৌদ্ধ-হিন্দু নির্বিশেষে সকলেই পাণিনি-রচিত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ন্যায়শাস্ত্র চর্চা করত। হিন্দুরা বুদ্ধকে দশমাবতারের অন্তর্ভুক্ত করে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অভিন্নতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়। সারনাথে আবিষ্কৃত শিবলিঙ্গকে ' শিবসঙ্ঘেশ্বর' অর্থাৎ সঙ্ঘের প্রভু বলে অভিহিত করা হয়েছে। উপরন্তু কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রমুখ হিন্দু সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় জনসাধারণের নিকট হিন্দুধর্মের আবেদন উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের আবেদন হ্রাস পায়। মহাযান মতের উৎপত্তি ও মূর্তিপূজার প্রচলন হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে ব্যবধান অনেক ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

(৩) ভাবজগতে বৌদ্ধদের পরাজয়

অশোকের সময় থেকেই ভাবজগতে বৌদ্ধদের সৃজনীশক্তির ক্রমাবনতি হতে থাকে। সুচতুর ও জ্ঞানী হিন্দু সংস্কারদের সঙ্গে বৌদ্ধরা ভাবজগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। কণিষ্কের পর ভারতের প্রতিভাসম্পন্ন বৌদ্ধ পণ্ডিত বা সন্ন্যাসীর আর আবির্ভাব ঘটেনি।

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের একশত বছরের মধ্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতানৈক্য ও

পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ফলে এর ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয় এবং এই ধর্মের অবনতির গতি ত্বরান্বিত হয়। বৈশালীতে আহূত বৌদ্ধসঙ্ঘের এক সম্মেলনে বৌদ্ধদের মধ্যে মতানৈক্য চরম আকার ধারণ করে।* সর্বশক্তিমান পোপ বা ধর্মগুরু না থাকায় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হয়। বৈশালী-সম্মেলন সম্পর্কে 'হীনযান ও মহাযান' সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতার তুলনায় তাদের হিন্দু-বিরোধিতা ম্লান হয়ে পড়ে।

(৪) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতভেদ ঃ হীনযান ও মহাযান

বৌদ্ধসঙ্ঘে নানাবিধ দুর্নীতি ও অনাচার প্রবেশ করায় এর শক্তিই যে শুধু বিনষ্ট হয়েছিল তা নয়, জনসাধারণের মনে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে এক গভীর প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকূল মনোভাব সঞ্চার হয়; এই দুর্নীতির প্রধানতম কারণ ছিল অর্থের প্রাচুর্য ও রাজানুগ্রহলাভ।

(৫) বৌদ্ধসঙ্ঘের দুর্নীতি

বৌদ্ধদের ওপর ধর্মীয় অত্যাচারের বেশ কিছু প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচারের মূলে ধর্মের প্রভাব কতখানি ছিল সে বিষয়ে বৌধ শাস্ত্রজ্ঞ রিজ-ডেভিডস্ (Rhys-Davids) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। রিজ-ডেভিডস্-এর মতে একমাত্র হূন-রাজ মিহিরকূলের আমলেই বৌদ্ধদের ওপর ধর্মীয় অত্যাচার চলেছিল। 'দিব্যবদন' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হিন্দু নৃপতিদের মধ্যে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ-ই সর্বপ্রথম বৌদ্ধদের নানাভাবে উৎপীড়িত করেছিলেন। পুরাণ অনুসারে পুষ্যমিত্র মৌর্য রাজবংশের অবসান ঘটিয়ে শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি জন্মসুত্রে ছিলেন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক। তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথ পুষ্যমিত্রকে ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করেছেন। পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন এরূপ প্রমাণ আছে। সুতরাং দিব্যবদন ও তারানাথের রচনা অনুসারে একথা বলা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের প্রতি পুষ্যমিত্রের মনোভাব ছিল বিদ্বেষপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে এই অনুমান করা যায় যে, পুষ্যমিত্রের বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী মনোভাবের মূলে ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মৌর্য রাজবংশকে উৎখাত করে পুষ্যমিত্রই হিন্দু রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(৬) ধর্মীয় নির্যাতন

পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পর বহু শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধদের ওপর ধর্মীয় অত্যাচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কুষাণদের আমলে বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা

** গৌতমবুদ্ধের জীবিতকালে তাঁর উপদেশ ও নির্দেশগুলি লিপিবদ্ধ না হওয়ায় তাঁর মহাপ্রয়াণের পর শিষ্যরা বুদ্ধের শিক্ষার নানা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। প্রথমত, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ও শৃঙ্খলা এবং বুদ্ধের শিক্ষার যথার্থ মূল্যায়ণ প্রভৃতি প্রশ্নে শিষ্যদের মধ্যে মতানৈক্যের উদ্ভব হয়। ফলে বুদ্ধের 'পরিনির্বাণের' এক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধদের মধ্যে বহু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল 'হীনযান' ও 'মহাযান'।*

ধর্মের মতভেদ দূর করণার্থে বৈশালীতে বৌদ্ধসঙ্ঘের যে অধিবেশন হয় তার সিদ্ধান্ত সকলে গ্রহণ করতে সম্মত হয় নি। এই সময় থেকেই বৌদ্ধরা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। যারা বৈশালীর সিদ্ধান্ত নিল তারা 'স্থবিরবাদী' বা 'থেরবাদী' সম্প্রদায় ও অপর দল 'মহাসংঘীক' বা আচার্যবাদী সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে উক্ত সম্প্রদায় দুটি যথাক্রমে হীনযান ও মহাযান নামে পরিচিত হয়। হীনযান মতাবলম্বীরা অহিংসা ও নিজের নির্বাণলাভ করার সাধনাকে পরম ধর্ম বলে মনে করে। এরা বুদ্ধের নিরাকার উপাসনার পক্ষপাতী। কিন্তু অপরপক্ষে মহাযান মতাবলম্বীরা নিজের নির্বাণের জন্য সাধনা করাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিবেচনা করে না। এরা সাধনার মূল্য স্বীকার করে ও বুদ্ধকে মনুষ্যসমাজের ত্রাণকর্তা বলে মনে করে অর্থাৎ তাঁরা বোধিসত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁরাই বুদ্ধদেব ও বোধিসত্ত্বের এবং মূর্তিপূজার প্রচলন করেন। হীনযান ও মহাযান পন্থীদের ধর্মগ্রন্থ রচিত হয় যথাক্রমে পালি ও সংস্কৃত ভাষায়। এই কারণে হীনযান ও মহাযান পন্থীদের যথাক্রমে বলা হয় পালি গোষ্ঠী ও সংস্কৃত গোষ্ঠী। হীনযান ও মহাযান পন্থীদের মধ্যে অপর পার্থক্য হল, হীনযান প্রধানত সিংহল (শ্রীলংকা) ও ব্রহ্মদেশেই প্রচলিত এবং এই কারণে এটিকে বলা হয় দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম। অপরদিকে, মহাযান প্রধানত নেপাল, চীন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে প্রচলিত এবং এই কারণে একে বলা হয় উত্তরস্থ বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু

লাভ করে। গুপ্ত সম্রাটরা ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণ করেন এবং তাদের আমলেই নালন্দার বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এই সময় ধর্মান্ধ হূন-রাজ মিহিরকুলের আবির্ভাব ঘটে। তিনি বহু বৌদ্ধকে হত্যা করেন। হিউয়েন সাং ও 'রাজতরঙ্গিনী' (কাশ্মীরের ইতিহাস) থেকে মিহিরকুলের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের বিবরণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাং-এর কথায় "He (Mihirakula) caused the demolition of 1600 stupas and monasteries and put to death nine 'kotis' of lay adherents of Buddhism". অন্যান্য চৈনিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে আগমন করেন।

বাংলার রাজা শশাঙ্ককেও বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হিউয়েন সাং-এর মতে শশাঙ্ক অগণিত বৌদ্ধকে হত্যা করেন এবং বুদ্ধগয়ায় পবিত্র বোধি-বৃক্ষটি উচ্ছেদ করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি ছিল।

স্মিথ-এর মতে মুসলমান আক্রমণকারীরা বৌদ্ধধর্মের ওপর চরম আঘাত হেনেছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের ভারত আক্রমণ, বৌদ্ধ মঠগুলির ধ্বংসসাধন ও অসংখ্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণ ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত প্রায়। স্মিথ্-এর ভাষায় "উত্তর-ভারতের শেষ আশ্রয় বিহারে এক ভাগ্যান্বেষী মুসলমানের তরবারির আঘাতে সুগঠিত বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস হয়ে যায় ("Buddhism as an organised religion in Bihar its last abode in upper India.....was destroyed once and for all by the sword of a single Muslim adventurer")। মুসলমানরা পূর্ব-ভারতের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকলে অবশিষ্ট বৌদ্ধরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলি নিয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব ও শঙ্করদেবের নেতৃত্বে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক আন্দোলনের ফলে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রায় মিশে যায়।

(৭) ইসলামের আবির্ভাব

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের অবদান ঃ বৌদ্ধধর্ম হল ভারতীয় দর্শনপ্রসূত এবং জাতীয়তাবাদী পটভূমিতেই এর আবির্ভাব। যদিও ব্যাপক প্রসারিত ধর্ম হিসেবে ভারতে বৌদ্ধধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে। তথাপি ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই ধর্মের অবদান অকিঞ্চিতকর নয়। এই

যেহেতু উত্তর-ভারতেই সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল এবং হীনযান ও মহাযানের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ সাদৃশ্য বিদ্যমান, সেইজন্য দক্ষিণী ও উত্তরস্থ এই বিভাজন যুক্তিসিদ্ধ নয়। এ ভিন্ন হীনযান ও মহাযান হল বৌদ্ধধর্মের দুটি ধারার প্রকাশমাত্র। সুতরাং উচ্চ ও নীচ মার্গ হিসেবেও বৌদ্ধধর্মের বিভাজন যুক্তিসঙ্গত নয়।

ঠিক কোন সময় বৌদ্ধসঙ্ঘের বিভাজনের সূচনা হয় তা বলা সহজ নয়। তথাপি মহাযান মতবাদের উৎপত্তি যে অকস্মাৎ হয়েছিল এমন কথা বলা যায় না। কয়েক শতাব্দী ধরে মহাযান মতবাদের বিবর্তন ঘটে। অনেকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 'মহাসংঘিকা' ও 'সার্বস্তিবাদি' নামে যে দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তাই মহাযান ধর্মসভার উৎস। অশোকের শিলালিপিতে মহাযান ধর্মমতের উল্লেখ নেই। এমনকি কণিষ্কের রাজত্বকালে বৈশালীতে আহূত বৌদ্ধ-সম্মেলনেও মহাযানের উল্লেখ পাওয়া যায় নি। ফা-হিয়েন-এর বিবরণীতেই সর্বপ্রথম মহাযান ধর্মমতের বিশেষ গুরুত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় (চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ)। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ অব্দের মধ্যেই এই ধর্মমতের বিকাশ ঘটে। এই সময় বহু অ-ভারতীয় মানুষ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়। এইরূপ মনে করা হয় যে, মহাযান হল বুদ্ধ তথা বৌদ্ধধর্মের সহজ ও সরল সংস্করণ এবং এই সরলীকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধধর্মকে অ-ভারতীয়দের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলা। আবার অনেকের মতে ভারতীয় বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষা সহজতর করে তোলার জন্যই মহাযান মতবাদের উদ্ভব হয়। বুদ্ধের শিক্ষা ও তাঁর আদর্শকে অবলম্বন করেই মহাযান মতবাদের উদ্ভব হয়। 'নির্বাণ' লাভের জন্য বুদ্ধ তিনটি পথের সন্ধান দিয়েছিলেন যথা—'আরহত্‌বাদ', 'প্রত্যক্ষবাদ' এবং নিজের জন্য নির্বাণের আদর্শ ত্যাগ করে পরের নির্বাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করা। মহাযান মতাবলম্বীরা ছিল তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত। পরবর্তী কালের নানা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্মের নবরূপায়ণের প্রয়োজন থেকেই মহাযান মতাদর্শের আবির্ভাব ঘটে।

ধর্ম একসময় মানুষের মনে এক নতুন জীবনের সঞ্চার করে ; জনপ্রিয় শক্তিগুলিকে সঞ্চালিত করে এবং নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী নতুন মনীষার উদ্ভব ঘটায়।

বৌদ্ধধর্মে শ্রেণীবৈষম্যের কোন স্থান ছিল না এবং অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্ণের মানুষকে সমাজে উত্তোলন করার প্রয়াস ছিল গভীর। ভারতীয়দের ধর্মীয় জীবনকে সুস্থ ও সরল করাই ছিল বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য। ভারতে সর্বপ্রথম গণতন্ত্রসম্মত ধর্মের প্রতিষ্ঠার আদর্শ বৌদ্ধধর্মে প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধসংঘগুলির সংগঠন উল্লেখ করা যায়।

বিশ্বের ইতিহাসে বুদ্ধই সর্বপ্রথম জীবের মুক্তির কথা ঘোষণা করেন যা মানুষ ইহজীবনে লাভ করতে পারে এবং এই মুক্তির জন্য তিনি ঈশ্বরের কৃপা বা ঐশ্বরিক ইচ্ছার কথা স্বীকার করেন নি।

বৌদ্ধধর্মের অপর অবদান হল ভারতে মূর্তিপূজার প্রচলন। মহাযান বৌদ্ধ ভাস্কর্য হল মূলত গান্ধার-শিল্প এবং ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে গান্ধার-শিল্প এক নতুন যুগের সূচনা করে। অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধদের নিকট থেকেই হিন্দুরা মূর্তিপূজার অনুপ্রেরণা পায়।

প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতির বিকাশে বৌদ্ধধর্মের অবদান অবিস্মরণীয়। বৌদ্ধধর্ম শিল্প-স্থাপত্যের প্রসারে সহায়ক হয়। বোধগয়া, সাঁচী, ভারহুত, সারনাথ, অমরাবতী ও অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের কালজয়ী নিদর্শন পাওয়া গেছে। শুধুমাত্র ভারতেই নয়, প্রাচীনকালে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারে বৌদ্ধধর্ম অনুঘটকের কাজ করে এবং বৌদ্ধ শিল্পরীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ অবদান হল বিহার। যদিও বৌদ্ধধর্মের পূর্বে বনবাসী হিন্দু সন্ন্যাসীদের আশ্রমের অস্তিত্ব ছিল, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে বুদ্ধের পূর্বে সন্ন্যাসীদের সংঘবদ্ধ আশ্রম-ভিত্তিক জীবনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশালাকার বিহার ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের মঠ বা আশ্রম গড়ে ওঠে। বৌদ্ধ বিহারগুলি শুধুমাত্র সন্ন্যাসীদের আবাসস্থলই ছিল না। এগুলি ক্রমে ক্রমে বিদ্যাচর্চার মহান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে সোমপুরী, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী ও নালন্দা প্রভৃতির নাম করা যায়। বৌদ্ধমঠের অনুকরণে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে শংকরাচার্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সন্ন্যাসীদের জন্য মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিককালে রামকৃষ্ণ মিশনও এই ধারা অনুসরণ করে চলেছে।

ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের অবদান অস্বীকার করা যায় না। বৌদ্ধ মঠগুলি ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। গুপ্ত ও বাংলার পাল যুগে যথাক্রমে নালন্দা ও বিক্রমশীলবিহার ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষার কেন্দ্র। বৌদ্ধ শিক্ষায়তনগুলিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল। শিক্ষার উৎকর্ষমানের জন্য বৌদ্ধ শিক্ষায়তনগুলি অগণিত বিদেশী পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতীদের আকর্ষণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ শিক্ষায়তনগুলি সেই প্রাচীন যুগে ভারত ও এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। ডক্টর আলতেকার (Altekar)-এর কথায়, "The cultural sympathy which the countries of Eastern Asia feel for India is entirely due to the work of the famous Buddhist college of ancient India"। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষাকে সংগঠিত গণ-শিক্ষায় উন্নীত করেছিল।

অশোক ও কণিষ্কের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের মর্যাদা লাভ করেছিল। তাঁদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সংস্কৃতি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মই ভারতীয় সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করেছিল।

জৈনধর্ম

জৈনধর্মের উৎপত্তি ঃ জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রায় সমসাময়িক। জৈনদের মতে বহু প্রাচীনকাল থেকে 'তীর্থংকর' নামে পরিচিত চব্বিশজন ধর্মগুরুর শিক্ষার দ্বারা জৈনধর্ম পুষ্টিলাভ করেছিল। এই সকল তীর্থংকরদের মধ্যে বাইশ জনের কোন ঐতিহাসিক সন্ধান পাওয়া যায় নি। এয়োবিংশ তীর্থংকর পার্শ্বনাথ সম্পর্কে জৈনধর্ম গ্রন্থাদিতে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ইনি কাশীর এক রাজার পুত্র ছিলেন। ত্রিশ বছর রাজপ্রাসাদের বিলাস-ব্যসনে লালিত-পালিত হবার পর তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করেন। তাঁর উপদেশ **'চতুর্যাম'** নামে খ্যাত, যথা—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ। জৈন সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি পার্শ্বনাথই রচনা করে যান।

জৈনধর্মের প্রথম শিক্ষাগুরু পার্শ্বনাথ ও প্রকৃত প্রবর্তক মহাবীর

মহাবীরের প্রথম জীবন ঃ আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে শেষ তীর্থংকর বর্ধমান মহাবীর বৈশালীর নিকট কুন্দুগ্রামে এক ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ও মাতা লিচ্ছবিবংশীয়া ত্রিশলা। তিনি যশোদা নাম্নী এক ক্ষত্রিয় নারীকে বিবাহ করেন ও তাঁর এক কন্যা জন্মলাভ করে। কন্যার নাম ছিল ত্রিশলা। ত্রিশ বছর বয়সে মহাবীর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কঠোর তপস্যার দ্বারা তিনি 'কৈবল্য' বা সিদ্ধিলাভ করেন এবং 'জিন' ও নির্গ্রন্থ নামে পরিচিত হন। পূর্ব-ভারতের বহু নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ত্রিশ বছর কাল তিনি কোশল, মগধ প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করে ৭২ বছর বয়সে দক্ষিণ-বিহারে পাবা নগরে দেহত্যাগ করেন (আনুমানিক ৪৬৮ খ্রীঃ পূর্ব অব্দে)। মহাবীরকে শেষ তীর্থংকর বলা হয়। জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্র' ভদ্রবাহু রচিত 'কল্পসূত্র' মহাবীরের জীবনকাহিনী রচনার প্রধান উপাদান।

ধর্মপ্রচারক হিসেবে মহাবীর ঃ 'কৈবল্য' লাভ করার পর মহাবীর ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁর ধর্মমত প্রচারে বৃত্ত হন। তিনি বছরের আট মাস নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে ধর্মোপদেশ বিতরণ করতেন এবং বর্ষার চারমাস কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অতিবাহিত করতেন। তিনি অল্পসময়ের মধ্যে চম্পা, বৈশালী, রাজগৃহ, মিথিলা, শ্রাবস্তি প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। তিনি বহু নৃপতির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। মগধের রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বুদ্ধের মত মহাবীর কোন এক নির্দিষ্ট ধর্মের প্রবর্তন করেন নি। তিনি পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত ধর্মের সংস্কার করেছিলেন মাত্র। সুতরাং মহাবীরের ভূমিকা ছিল ধর্ম সংস্কারের। অবশ্য জৈনধর্ম বলতে মূলত মহাবীরের ধর্মমতই বোঝায়। তিনি পার্শ্বনাথের চারটি বিধানের সঙ্গে আরও একটি বিধান যুক্ত করেন, যথা—'শুচিতা' বা ব্রহ্মচর্য। পার্শ্বনাথ শিষ্যদের সাদা বস্ত্র পরিধানের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মহাবীর বস্ত্র পরিহার করার নির্দেশ দেন। মহাবীর বিশ্বাস করতেন যে, যথার্থ বিশ্বাস, যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ সদাচরণের মাধ্যমে মানুষ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে সিদ্ধসিসিলা লাভ করতে পারে। কৃচ্ছ্র সাধনকেই তিনি শাশ্বত সত্যকে জানবার একমাত্র উপায় হিসেবে মনে করতেন। এই কারণে তিনি অনশনে মৃত্যুকে বরণ করার নির্দেশ দিয়ে যান। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। উগ্র অহিংসাবাদের কথা তিনি প্রচার করেন।

জৈন ধর্মমত ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পার্শ্বনাথের 'চতুর্যাম' বিধানের সঙ্গে মহাবীর অপর একটি বিধান যোগ করেন এবং তা হল 'শুচিতা' বা ব্রহ্মচর্য। এই পাঁচটি বিধান বা আদর্শ একসঙ্গে 'পঞ্চ মহাব্রত' নামে খ্যাত। জৈনধর্ম একান্তভাবে নিরীশ্বরবাদী। এই ধর্মে ঈশ্বরকে বিশ্বের সৃষ্টি ও রক্ষাকর্তা বলে স্বীকার করা হয় নি। জৈনদের মতে মানুষের আত্মার ভিতরে

ঈশ্বরের সকল শক্তি ও গুণরাজি পূর্ণভাবে বিকশিত। জৈনরা জীবের ব্যাপক অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং তাদের কাছে জীব অতি পবিত্র। কর্মের বন্ধনই জীবকে অপবিত্র করে। জৈনদের মতে এই অপবিত্রতা দূর করে জীবদের পবিত্রতালাভ করাই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। এর জন্য প্রয়োজন সংযত জীবনযাপন। সংসারে সংযত জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব। এই কারণে জৈনধর্মে মঠ-জীবনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জৈনদের মতে প্রতিটি বস্তুর (অজীব—Matter) জীবন বা প্রাণ আছে। তাদের মতে জীব ও অজীবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়েই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ত কাজ করে চলেছে। জৈনধর্ম অনুসারে জন্মান্তর ও কর্মফলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় হল সত্য বিশ্বাস, সত্য জ্ঞান ও সদাচরণ। এই তিনটি আদর্শ 'ত্রিরত্ন' নামে খ্যাত। জৈনদের সাধনা একান্তভাবে ত্যাগ ও পবিত্রতার সাধনা। জৈনরা কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী এবং কঠোর তপশ্চরণ, আত্মোপলব্ধি ও সিদ্ধিলাভের সহায়ক বলে মনে করে।

জৈনধর্মের প্রথম ইতিহাস ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। মহাবীর ও গৌতম উভয়েই পূর্ব-ভারতে তাদের নিজ নিজ ধর্মমত প্রচার করেন এবং জনসাধারণের একই শ্রেণী থেকে শিষ্য সংগ্রহ করেন। প্রথম দিকে অবশ্য জৈনধর্ম অধিক সাফল্য লাভ করে। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ি এবং নন্দরাজাদের রাজত্বকালে জৈনরা রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। নন্দবংশের শেষ রাজা 'ধন' বা উগ্রসৈন্যের রাজত্বকালে সম্ভূত বিজয় ও ভদ্রবাহু জৈনসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের শাসনকালে সম্ভূত বিজয়ের মৃত্যু হলে ভদ্রবাহু জৈনদের সর্বোচ্চ অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য সম্ভবত জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে পূর্ব-ভারতে দুর্ভিক্ষজনিত অন্নকষ্ট ও দুর্দশার ফলে ভদ্রবাহু তাঁর কিছুসংখ্যক শিষ্যকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু বহু জৈনধর্মাবলম্বীরা স্থূলভদ্রের অধ্যক্ষতাধীনে মগধেই থেকে যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে জৈনরা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বররা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করত এবং দিগম্বররা মহাবীরের অনুকরণে নগ্ন থাকত। ভদ্রবাহুর শিষ্যদের দিগম্বর ও স্থূলভদ্রের শিষ্যদের শ্বেতাম্বর বলা হত। দিগম্বররা নগ্ন থাকার পক্ষপাতী ছিল এবং বল্লভীর সভায় সংকলিত 'দ্বাদশ অঙ্গ' তারা প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করত না। এ ভিন্ন শ্বেতাম্বররা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশ্বাস করত যে, তপশ্চরণের দ্বারা মোক্ষলাভের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু দিগম্বরদের মতে একমাত্র পুরুষরাই মোক্ষলাভের অধিকারী। উপরোক্ত মতভেদের জন্যই জৈনসম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

জৈনসম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য ও এর কারণ

জৈনধর্ম ভারতের বাইরে প্রসার লাভ করে নি। কিন্তু বহু যুগ ধরে এই ধর্ম দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ছিল।

জৈন ধর্মগ্রন্থ ও জৈনধর্মের বিস্তার ঃ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পাটলিপুত্রে আহূত জৈনদের সম্মেলনে মহাবীরের উপদেশসমূহ বারটি অঙ্গে সংকলিত করা হয়। এটি 'দ্বাদশ অঙ্গ' সিদ্ধান্ত নামে খ্যাত। গ্রন্থগুলির পুনর্বিবেচনার জন্য পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে বল্লভীতে আর একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সভায় জৈন ধর্মনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। এই নীতিগুলির সংকলন অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল, সূত্র প্রভৃতি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু দিগম্বরগণ কর্তৃক এই 'দ্বাদশ অঙ্গ' প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র বলে স্বীকৃত হয় নি। এই শাস্ত্র প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। সপ্তম ও অষ্টম খ্রীষ্টাব্দ থেকে সংস্কৃত ভাষায় ভাষ্য ও দার্শনিক সাহিত্যের রচনা আরম্ভ হয়; কিন্তু জৈনধর্ম ও ধর্মসাহিত্য জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। অবশ্য দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজবংশ যথা—চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও গঙ্গ প্রভৃতি জৈনধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজারা জৈন

সাহিত্যের ও শিল্পের প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। দাক্ষিণাত্যে জৈন সাহিত্যে ও শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে গুণভদ্র, জীনসেন প্রমুখের নাম উল্লেখ্য।

জৈনধর্ম দক্ষিণ-বিহারে উৎপত্তিলাভ করে কালক্রমে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বিস্তার লাভ করে। কথিত আছে যে, মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করে অন্তিম বয়সে মহীশূরের শ্রবণবেলগোলায় চলে যান এবং তথায় কৃচ্ছ্রসাধনের পর দেহত্যাগ করেন। দক্ষিণ-ভারতে জৈনধর্মের বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন ভদ্রবাহু। শ্রবণবেলগোলায় চন্দ্রগুপ্তের নামানুসারে চন্দ্রগিরি নামে এক পার্বত্য গুহা নির্মিত হয়।

হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মে সাদৃশ্য ও পার্থক্য :

সাদৃশ্য : বৈদিক হিন্দুধর্মের প্রতিবাদে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তি হলেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতকে একান্তভাবে বেদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক বলে মনে করলে ভুল হবে। ম্যাক্স মূলার (Max Muller)-এর মতে বৌদ্ধধর্মকে কোন এক নতুন ধর্ম বলা যায় না ; ভারতীয়দের ধর্মীয়, দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার এক স্বাভাবিক পরিণতি। আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে রিজ ডেভিডস্ মন্তব্য করেন যে, বুদ্ধ হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিন্দু হিসেবেই মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। মূলত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম হিন্দুধর্মের শাখা এবং বৈদিক দর্শন ও মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দর্শনের দিক থেকে বিচার করলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতকে উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি বলা যেতে পারে। জৈনধর্মের 'কর্মবাদ' ও বৌদ্ধধর্মের 'কর্মবাদ' ও আত্মার 'দেহান্তরবাদ' বস্তুত হিন্দুধর্ম থেকেই গৃহীত। হিন্দুধর্মের অনুকরণে মহাযান বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার প্রচলন আছে। অন্যদিকে হিন্দুদের মত জৈনরা লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করে থাকে।

পার্থক্য : কিন্তু এই সকল সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের সঙ্গে এই দুটি ধর্মের মৌলিক পার্থক্যও আছে। জৈন ও বৌদ্ধেরা বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করে না এবং যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডকে মোক্ষের সোপান বলে মনে করে না। হিন্দুরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্মানুমোদিত বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, জৈন ও বৌদ্ধরা স্বীকার করে না। উপনিষদে অহিংসার উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধেরা অহিংসা-নীতির ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। হিন্দুধর্মে সঙ্ঘের উল্লেখ নেই, কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে সাদৃশ্য ও পার্থক্য : বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রায় একই সময়ে পূর্ব-ভারতে উৎপত্তি লাভ করেছিল। বৈদিক ধর্মের প্রতিবাদ হিসেবেই এই দুই ধর্মের উৎপত্তি হয়, যদিও এই দুই ধর্মই বেদের কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়রাই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবর্তন করেন। মহাবীর ও বুদ্ধ দুজনেই ছিলেন রাজপরিবারভুক্ত। রাজানুগ্রহ দুই ধর্মের সম্প্রসারণে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর মানুষরাই এই দুই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল বিশেষ করে সামাজিক মান-মর্যাদা থেকে বঞ্চিত বৈশ্যরা ও নিয়ত অত্যাচারিত শূদ্ররা। সরাসরি জাতিভেদ-প্রথার বিরোধিতা না করলেও এই দুই ধর্ম ছিল বর্ণ-বিরোধী। সেই দিক থেকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে বর্ণ-বিরোধী আন্দোলন বলা যায়। এর ফলে চতুর্বর্ণের গণ্ডির বাইরে যে সব জাতি বা বর্ণ ছিল—তারা এই দুই ধর্মে প্রবেশাধিকার পায়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্যয়বহুল পূজা-পার্বণের মত ব্যয়বহুল পূজা-পার্বণের রীতি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে না থাকায়, দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মানুষ এই দুই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উচ্চতর ও দুর্বোধ্য দর্শন বর্জন করে সহজ, সরল নীতিসম্মত জীবনযাপনের আদর্শ প্রচার করে এই দুই ধর্ম

সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে সফল হয়। দুই ধর্মে সহজ ও বোধগম্য ভাষায় ধর্ম প্রচারের প্রয়াস দেখা যায়।

পার্থক্য ঃ কিন্তু সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এই দুটি ধর্মের মধ্যে পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা জৈনধর্মে অহিংসা নীতির ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জৈনরা মনে করেন অচেতন পদার্থের মধ্যেও প্রাণ আছে। এই বিশ্বাসে তারা এদের প্রতিও অহিংসা নীতি প্রয়োগ করার পক্ষপাতী। কিন্তু বৌদ্ধরা তা স্বীকার করে না। জৈনরা কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী এবং তাদের মতে তা মোক্ষলাভের সহায়ক। কিন্তু বৌদ্ধরা সাংসারিক ভোগ-লালসায় আসক্তি ও কৃচ্ছ্রসাধন উভয় চরমপন্থা পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বনে বিশ্বাসী। জৈনধর্মের ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাব বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা বেশি। উভয় ধর্ম জাতিভেদ-প্রথার বিরোধী হলেও জৈনধর্মে এর কিছু প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর অন্যতম প্রধান স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং ভারতের বাইরে বহু দেশে তা প্রসারলাভ করেছিল। কিন্তু জৈনধর্ম ভারতের সীমানা অতিক্রম করে নি বললেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে, বহুকাল পূর্বেই বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের একটা বিশিষ্ট শ্রেণী আজও জৈনধর্মাবলম্বী।

উভয় ধর্মমতই 'ত্রিরত্নে' বা তিনটি বিশেষগুণে বিশ্বাসী, কিন্তু উভয় ধর্মেই এর বিশ্লেষণ বিভিন্ন রূপে করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মমত অনুসারে এই 'ত্রিরত্ন' হল 'বুদ্ধ', 'ধর্ম' ও 'সঙ্ঘ'। অপরদিকে, জৈন ধর্মমতানুসারে তা হল 'যথার্থ বিশ্বাস', 'সদাচরণ' ও 'যথার্থ জ্ঞান'। জৈনরা 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বৌদ্ধরাও 'হীনযান' ও 'মহাযান' সম্প্রদায়ে বিভক্ত। জৈনরা চব্বিশজন তীর্থংকরে বিশ্বাসী এবং বৌদ্ধেরা চব্বিশজন বুদ্ধে বিশ্বাসী।

জৈনধর্মের অবদান ঃ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জৈনধর্মের অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়। বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মেও বাণিজ্যিক সততা ও মিতব্যয়িতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিষ্ঠা ও সততা সহকারে ব্যবসা-বাণিজ্য করার কথা জৈনধর্মে বলা হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে জৈনধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে। কিন্তু জীবহত্যার বিরুদ্ধে কঠোর অনুশাসন থাকায় কৃষকশ্রেণীর মধ্যে জৈনধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটেনি। কারণ কৃষিকার্যের সময় কীট-পতঙ্গের প্রাণনাশ অনিবার্য হয়। জৈনধর্মে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে বিধিনিষেধ থাকায় জৈনদের মধ্যে ভূসম্পত্তি অর্জন করার প্রবণতা খুবই কম। এই কারণে তারা পেশা হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে জৈনরা সামুদ্রিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে শুধু যে নিজেদের আর্থিক সম্পদের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে তা নয়, তারা নগর-সংস্কৃতির উন্মেষের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জৈনধর্মের অবদান অনস্বীকার্য। প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার প্রসারে জৈন সন্ন্যাসীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এই দুই ভাষায় তারা অনেক টীকাভাষ্য রচনা করে গেছেন। নয়চন্দ্র জৈন ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের এক প্রখ্যাত কবি। কালিদাসের প্রখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ ছিলেন জৈন। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও সেগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারে জৈন বিহারগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 'অর্ধ-মগধি' নামে এক মিশ্র ভাষায় মহাবীর ধর্মমত প্রচার করতেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বক্তব্য সাধারণ মানুষের নিকট বোধগম্য করে তোলা। বর্তমান কালের হিন্দি, মারাঠী, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তির পূর্বে যে সকল ভাষার প্রচলন ছিল সেগুলির সংমিশ্রণে জৈনরা একটি নতুন ভাষার উদ্ভাবন করে যা 'অপভ্রংশ' ভাষা নামে পরিচিত। এই ভাষা

একদিকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা ও অন্যদিকে আধুনিক আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। জৈনরাই তামিল ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। শিল্পের ক্ষেত্রেও জৈনধর্মের অবদান রয়েছে। মাউন্ট আবুতে নির্মিত বিখ্যাত জৈন মন্দির জৈন শিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এটি ভিন্ন মহীশূরের অন্তর্গত শ্রাবণবেলগোলার মন্দিরটিও জৈন গৃহীদের ধর্মবোধের অপর এক নিদর্শন। শ্রাবণবেলগোলার গোমতেশ্বরের মূর্তিটি আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। পাহাড়-পর্বতে গুহা-মন্দির নির্মাণের ব্যাপারেও জৈনদের অবদান রয়েছে। এই প্রসঙ্গেই উড়িষ্যার 'হাতিগুম্ফ গুহা'র উল্লেখ করা যায়।

অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় ঃ আর্য ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচলিত হয়েছিল এ কথা বলা যায় না। পুরাণের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণই ছিল এবং বৌদ্ধ ও জৈন উপাখ্যানে ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে জীবাত্মার মুক্তির পথ নতুন করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে মাত্র। আর্য ঐতিহ্যের সঙ্গে এই দুই ধর্মের সঙ্গে কিছু পরিমাণে সাদৃশ্য থাকায় প্রথম দিকে ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা জোরদার হয়ে ওঠেনি। বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশ প্রচারকালে গোঁড়াপন্থীরা কখনই উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম পৌরাণিক ধর্মকে ম্লান করে ফেলবে। সেই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধবাদী (heretical) ধর্মীয় সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এই সম্প্রদায়গুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বহু যোগী সঙ্ঘের উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে 'আজীবিকাশ' নামক শূদ্র সন্ন্যাসীদের উল্লেখ করা যায়, যাঁদের নেতা ছিলেন মাখালি গোসল (Makhali Gosala)। প্রথম জীবনে মাখালি ছিলেন ক্রীতদাস। তিনি ছিলেন একজন উগ্র ধর্মপ্রচারক এবং হিন্দুদের 'কর্মবাদের' তীব্র সমালোচক। সেই যুগের চরমপন্থী অপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন 'অজিতা কেশ কাম্বালা' যিনি মৃত্যুর সঙ্গে সব কিছুরই অবসান-তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। 'পুরাণ কাস্যাপো' নামে এক ব্রাহ্মণ ধর্মগুরুরও পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। 'চারবাক্' (Charvakas) নামে আর একটি নাস্তিক ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মৃত্তিকা থেকে মানুষের জন্ম ও মৃত্তিকাতেই এর লয়'—এই দার্শনিক তত্ত্বেই চারবাক্‌রা বিশ্বাসী ছিল। এই সকল বিরুদ্ধবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি ব্রাহ্মণ্যবাদী গোঁড়াপন্থীদের মনোভাব ছিল অত্যন্ত কঠোর। বুদ্ধের শিক্ষা-প্রচারের কালে এই ধরনের বহু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও এঁদের কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নি।

মৌর্য যুগে ধর্ম ঃ মহাকাব্য দুটির প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিকেও দেবতাজ্ঞানে পূজার প্রচলন এই যুগেই শুরু হয়। পাণিনির গ্রন্থে 'বাসুদেবে'র উল্লেখ আছে এবং কৃষ্ণের পরেই তাঁর ভ্রাতা 'বলরাম' খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে দেবতাজ্ঞানে পূজিত হতে থাকেন। পতঞ্জলির গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মৌর্যযুগে 'শিব', 'স্কন্দ' ও 'বিশাখার মূর্তি' প্রদর্শিত ও বিক্রীত হত। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে 'ইন্দ্র' ও 'বরুণ' ছিলেন প্রধান।

বৈদিক যুগের মত যজ্ঞ ও পশুবলি এই যুগেও প্রচলিত ছিল এবং তা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অঙ্গ ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে বহুবিধ যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—'অশ্বমেধ' 'বাজপেয়', 'পুরুষমেধ' প্রভৃতি। রাজন্যবর্গের মধ্যে 'অশ্বমেধ' ও 'বাজপেয়' যজ্ঞানুষ্ঠান রীতিমত প্রচলিত ছিল।

এই যুগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রবল হয়ে উঠলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মও প্রচলিত ছিল। অশোকের অনুশাসনে ব্রাহ্মণ্যদের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম অযোধ্যা, বিহার ও উড়িষ্যায় খুবই জনপ্রিয় ছিল। জনশ্রুতি অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন।